অচিনপুরের অচিন মানুষ
মিজানুর রানা

প্রথম দর্শনেই তাকে যথেষ্ট সুন্দরী বলে মনে হলো। অনাবিল লাবণ্যপ্রভা বিরাজ করছে তার অবয়বে। লাজুকলতা। এক পলকে দেখেই আমি তাকে চূড়ান্ত অপছন্দ করলাম। অপছন্দ করার কারণ হচ্ছে, আমি যে ‘ঘর পোড়া গরু’, তাই ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখলেই ভয় পাই। সুন্দরী, রূপসী চমৎকার গড়নের মেয়ে মানুষ-এর প্রতি আমার চরম ক্ষোভ। আমার এ বক্তব্যের সাথে পরিবারেরই কেউ-ই একমত নয়। ওরা বলে, ‘যত দোষ নন্দ ঘোষ।’ ‘উদোর পিÊি বুধোর ঘাড়ে’ চাপানো নাকি সমীচিন ও শোভনীয় নয়। জানি কথাটা নির্ভেজাল সত্য, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। আমি হচ্ছি ‘হিমু’র বড় ভাই। অর্থাৎ তার চেয়ে এক মিটার উঁচু।

আমার মধ্যে বিরাজ করে সর্বদা দু’টি সত্ত্বা। সামান্য কিছুতেই প্রচÊ ক্রোধে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে মোমের মত নরম হওয়া। আমার কথায় বা ভাব-ভঙ্গিতে কখনো কোমলতা প্রকাশ পায় না, অথচ অন্যরা কোমল স্বরে কথা বলুক তা-ই আমি চাই। মারদাঙ্গা ছায়াছবি ‘জেমস বÊ’ যেমন পছন্দ করি, তেমনি কৌতুককর কোনো অনুষ্ঠান বা কার্টুন ছবিও বাচ্চাদের সাথে বসে উপভোগ করি। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই সত্ত্বা বিরাজ করছে আমার মধ্যে। কেন আমি এমন? কোনো সুন্দরী মেয়েমানুষ আমার চক্ষুশূল! সেটাও এক গবেষণার বিষয়। কেন আমি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করি? সবই তো মানুষ, কেউ কালো কেউ সুন্দর-সুন্দরী।

‘নিশ্চয়ই কোনো সুন্দরী মেয়েমানুষ তোমাকে ঝাঁটাপেটা করেছে?’ বললো ছোট ভাই হিমু।

‘পাকামো করিস্ না হিমু। মানব জীবনের কূটিলতা সম্পর্কে তোর কোনো ধারণাই নেই। সুন্দরী নারীরা বেশিরভাগই অহংকারী ও প্রবঞ্চক হয়।’ আমি বিরক্ত কণ্ঠে বললাম।

খিল্‌খিল করে হেসে উঠল হিমু। সে বললো, ‘ভাইয়া এ মেয়েকে বিয়ে তোমার করতেই হবে। মেয়েটির নাম মিতা। তোমার নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল আছে। তাছাড়া তোমাদের দু’জনেরই সিংহ রাশি। মিলবে ভালো। যেন সোনায় সোহাগা।’

বাবা-মা, ছোট বোন এরিনা এবং হিমুর পছন্দ, মতামতের ভিত্তিতেই ধরতে গেলে জোর করে বিয়েটা হয়ে গেল। আমার কোনো ভাব-দর্শন, যুক্তি, তত্ত্ব, মতামত গ্রাহ্য হলো না। যেন কোরবানীর গরু আমি। গরুর আবার মতামতের দরকার কী?

দুই চোখে রাজ্যের ঘুম নিয়ে প্রবেশ করলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসর ঘরে। ফুল বিছানো ডিভানে বসে আছে মিতা। আমি খুব সুন্দর করে তার নাম ধরে ডাকলাম, ‘‘মিতা....।’’ মিতা বসে আছে অনড়ভাবে, নির্বিকার। আমার পানে তাকাল না, কী যেন ভাবছে।

আমি তার পাশে বসলাম। কী যেন ধ্যান করছে সে। আমি বললাম, ‘‘ভালো আছ মিতা?’

সে কোনো কথা বললো না। একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন পাথরমূর্তি। আমি তার নাকের কাছে হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখলাম বেঁচে আছে, নাকি পাথরমূর্তি হয়ে গেছে। হয়তো আমার মতই কঠিন আঘাতে শোকপ্রাপ্ত মানুষ। কথায় আছে না- ‘অধিক শোকে পাথর।’ যত্তসব পাথর মানুষের আনাগোনা আমার কাছে। হায়রে নিয়তি!

না! শ্বাস-প্রশ্বাস বেরুচ্ছে নিয়মিত। আমি তার হাতের ওপর হাত রাখলাম। উষ্ণতা তার হাত, শরীরময়। বললাম, কী ভাবছো? কথা বলবে না আমার সাথে?

অনেকক্ষণ নীরব থেকে হঠাৎ যেন কোনো অচেনা জগৎ থেকে ফিরে এলো সে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললো, ‘ওঃ তুমি? কিছু বলছিলে আমাকে?’

‘আমি গুনগুন করে গাইলাম, ‘‘আমার বলার কিছু ছিলো না.....না গো আমার.....।’

‘কি মানুষ তুমি, বাসর রাতে বৌ’র সাথে প্রেমের কথা বলবে, তা’ না করে গান গাইছো....।’

‘আমি এখানে এসেছি প্রায় ৬ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড। তোমাকে কি সুন্দর করে ডাকলাম, ‘মিতা’ ‘মিতা’ বলে। অথচ তুমি ধ্যান করছো অন্য জগতের। কী ভাবছো? কোনো সমস্যা?’

‘না। আমার একটা অন্য পৃথিবী আছে। মাঝে মাঝে আমি সে পৃথিবীতে হারিয়ে যাই। তখন চার-পাঁচ মিনিটের জন্যে পাথরের মতো হয়ে যাই। কেউ ডাক দিলে তার কোনো কথা শুনতে পাই না।’

প্রমাদ গুণলাম। আমার সুন্দরী তত্ত্ব এবার বুঝি কাজে লাগাবার সময় এসেছে। পুরো দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেব, দেখ আমার কথাই ঠিক। সুন্দরী মেয়েরা শুধু অহংকারীই হয় না, পাথরও হয়ে যায়। নিজের মনেই আমি হেসে উঠলাম।

কিছুদিন পর। হিমুই প্রথম আবিষ্কার করল ব্যাপারটা। মিতা’র মাঝে মাঝে এমন হয় কয়েক মিনিটের জন্যে, চলে যায় অন্য জগতে। এক ধ্যান করে বসে থাকে। ডাকাডাকি করলেও নির্বিকার, নিশ্চল- সাড়া দেয় না। কিছুক্ষণ পর যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। এরপর বলে, ‘আমার কী হয়েছিলো?’

গ্রামের এক বিধবা, ‘কাজ নেই খই ভাজ’- কিসিমের হনুফার মা পুরো গ্রামে ছড়িয়ে দিল যে, অমুকের ছেলের সুন্দরী বউকে জ্বীনে আছর করেছে। মাঝে মাঝে জ্বীন এলে বোবা হয়ে যায়, কথা বলতে পারে না। এক দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল

করে তাকিয়ে থাকে। আর যায় কোথায়! পুরো গ্রামের মানুষ দল বেঁধে আসতে শুরু করল জ্বীনেধরা বউকে দেখতে। মানুষের জন্য বাড়িতে থাকাই দায় হয়ে পড়েছে। নানাজনে নানা মন্তব্য শুরু করছে। অবশ্য আমি তাতে কর্ণপাত করি না। কারণ বিয়ের পর হতেই আস্তে আস্তে মিতা ও সুন্দরী তত্ত্ব আমার কাছে পরিস্কার হয়ে আসছে।

মিতা সহজ সরল মানুষ। কোনো প্রকার অহংকার তার মধ্যে নেই। আসলে ভুল আমারই। আমি সে অন্ধ দশজন মানুষদের দলের একজন- যারা হাতি দর্শন করতে গিয়ে হাতির গায়ে হাত দিয়ে একজন বলে- 'হাতি দেখতে বিরাট পাহাড়ের মতো', অন্যজন লেজে ধরে বলে, 'হাতি দেখতে সাপের মতো'।

চার পাঁচ দিন পর। এক সাহিত্যাঙ্গনে গিয়েছিলাম নিজ পাণ্ডিত্যের ধার জাহির করতে। আলোচনা-সমালোচনার ভর্তা জগাখিচুড়ি বানিয়ে, নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য সবাইকে শুনিয়ে, তাক্ লাগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ওমা! একি অবাক কাণ্ড। বাড়িতে কিসের এত শোরগোল? ব্যাপারটা কী?

জ্বীনচালা দিচ্ছে এক কবিরাজ। মিতাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মাটিতে। তার শরীরে ওপর একটি লাল সালু বিছিয়ে কবিরাজ ঝাড়ু দিয়ে মনের সুখে পেটাচ্ছে ও মন্ত্র আওড়াচ্ছে। বাবা-মা, হিমু, ছোট বোন এরিনা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। প্রতিবার ঝাড়ুর আঘাতে চিৎকার করে উঠছে মিতা। আর কবিরাজ বলছে, 'দেখছেন দুষ্ট জ্বীনটা কী চিৎকার করছে? আমার হাতে থেকে রেহাই পাবি না দুষ্ট জ্বীন। তোকে যেতেই হবে....।'

মারতে মারতে মিতার শরীর রক্তাক্ত করে ফেলেছে কবিরাজ। এ দৃশ্য আমি আর সইতে পারলাম না। সুন্দর আর অসুন্দর তত্ত্ব যেন হাওয়ায় মিশে গেল আমার অন্তর থেকে। মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত অনুভূতি, মায়া-মমতা অন্তরে জেগে উঠল নিমিষেই। চিৎকার করে উঠলাম, 'থামো। আর একটিও আঘাত করবে না ওকে।' কবিরাজের গলা চেপে ধরলাম আমি। "শালা! বানচোতের বাচ্ছা, জ্বীনচালা দিচ্ছ না? গ্রামের অসহায় মানুষের সরলতার সুযোগে অর্থ হাতিয়ে নিতে এসেছো?"

'ভুল করছেন মি. মিনহাজ তালুকদার।' কবিরাজ ধমকে উঠল আমাকে। 'জ্বীনটা যাবার সময় হয়েছে। এখন যদি মাঝপথে থেমে যাই, তাহলে জ্বীনটা রোগীকে মেরে ফেলবে।'

পাছায় কষে একটা লাথি মারলাম কবিরাজের। 'এখান থেকে তোর জ্বীনকে নিয়ে বিদায় হ্ হারামজাদা। নইলে আমিই তোকে মেরে ফেলবো এখন।'

মিতাকে হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করালাম। সে সুস্থ্য হয়ে উঠে আমাকে তার শয্যার পাশে দেখেই কৃতজ্ঞতা জানাল। বলল, 'সেদিন তুমি না এলে কবিরাজ আমাকে মেরেই ফেলতো। আচ্ছা আসলেই কি আমার কাছে কোনো জ্বীন-পরী আছে নাকি?'

'জানি না। আমি কী জ্বীন বিয়ষক পড়াশোনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়েছি নাকি?'

মিতা খিলখিল করে হেসে উঠল বাচ্ছা মেয়ের মতো। পরক্ষণেই কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তোমার মতো স্বামী পেয়ে আমি খুব গর্ববোধ করছি মিনহাজ। আমি তোমাকে ভালোবাসি, অনেক- অনেক।'

'আমিও তাই মিতা, তুমি আমার জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ধারণাকে একদম পাল্টিয়ে দিয়েছো। অথচ মানুষ সম্পর্কে আমি অন্যধারণা পোষণ করতাম!'

ডা. বদরুল আলম। একজন সাইকিয়াটিস্ট। ফ্রেঞ্চ কাট্ দাঁড়ি, মাথায় কোনো চুল নেই। টাক্। চোখে বিরাট এক চশমা। নামের আগে 'বদ' শব্দটি কেন তিনি লাগিয়েছেন তা' আমার জানা নেই। যার নামের শুরুতেই 'বদ' শব্দটি থাকে, সে কি ভালো লোক হয়? যাহোক তার চেম্বারে মিতাকে নিয়ে এলাম এইমাত্র। তিনি বললেন, "সব সমস্যার কথা মন খুলে বলুন।'

'সে হঠাৎ করে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে যায়।" আমি বলতে লাগলাম, "হাতের কাজ যা থাকে তা বন্ধ করে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, কিছুক্ষণ পরে সে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কিছুই বলতে পারে না। গ্রামের এক কবিরাজ কয়েকদিন আগে জ্বীনচালা দিয়েছিল....।' আমি সব কথা তাকে বলতে লাগলাম।

হাত ইশারায় আমাকে থামতে বললেন। এরপর খুক্খুক করে কাশ্লেন। পাশে রাখা একটি গামলামত পাত্রে থুঃ থুঃ করে পানের পিক ফেলার মত থু থু ফেললেন তিনি।

'আপনার নাম?' মিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তিনি।

'জ্বি আমার নাম মিতা।'

'মিসেস রীতা শুনুন আপনার আসলে....'

'ওর নাম মিতা। রীতা নয়।' আমি ভুল সংশোধন করে দিলাম।

'হ্যাঁ, মিসেস মিতা, আপনি কি রাতে কোনো বিশ্রী স্বপ্ন দেখেন?'

'না।'

'সুন্দর কোনো স্বপ্ন।'

'তা' দেখি?'

'যেমন।'

'যেমন দেখি আমার স্বামী আমাকে খুব ভালোবাসেন, আমিও মন-প্রাণ দিয়ে ওকে ভালোবাসি। ভালোবাসার এক পর্যায়ে...।'

'থাক আর বলতে হবে না। এটা স্বাভাবিক স্বপ্ন, বিবাহিতা মেয়েরা এধরণের স্বপ্ন দেখবে এটাই স্বাভাবিক। শুনুন, আপনার আসলে যে সমস্যা, এটা কোনো প্রকার জ্বীন-ভূত সংক্রান্ত বা কোনো অলৌকিক ব্যাপার না। এটা এক ধরণের মৃগী রোগ, যার নাম হচ্ছে অ্যাবসেন্স সিজার (Absence Seizure)। মৃগী এক ধরণের নিউরোসাইকিয়াট্রিক ডিসওডার। মস্তিস্কের কোনো একটি অংশে বার বার ইলেক্ট্রিক্যাল ডিসচার্জ হওয়ার কারণে মৃগী রোগ হয়। এ রোগ নানা রকমের আছে, তবে খিচুনি হওয়া প্রধান লক্ষণ। আপনার কী খিচুনী হয়?'

'না।' মিতা জবাব দিল।

'নানা ধরনের মৃগী রোগ আছে এবং মৃগী রোগের নানা কারণ আছে। যেমন বংশগত বা জন্মগত। জন্মের সময়ে অসুবিধা, মাথা আঘাত পাওয়া, ব্রেন টিউমার, মস্তিস্কের প্রদাহ ইত্যাদি। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মৃগী রোগের চিকিৎসা আছে। ধৈর্য ধরে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শে থাকলে সুস্থ হওয়া যায়।'

ডা. বদরুল আলম-এর চেম্বার থেকে প্রয়োজনীয় কথা-বার্তা সেরে বের হলাম আমরা দু'জন। রিক্শায় উঠতে যাবো, এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিল কেউ, 'স্যার।'

আমি ঘাড় ফেরালাম এবং চম্‌কে উঠলাম। ওরা তিনজন। দু'জনকে চিনি, আমার ছাত্র-ছাত্রী। দিপু এবং তার বোন সাহানা। অন্যজন অচেনা, মুখে এলোমেলো দাঁড়ি। ফ্যাকাশে চেহারা। চোখে রাজ্যের ঘুম। যেন অপু পাগলার যমজ ভাই।

কমপক্ষে বার/তের বছর পর ওদের সাথে দেখা। আমি বললাম, 'দিপু তোমরা কেমন আছো।'

দিপু ও সাহানা আমাকে সালাম করল। কিন্তু পাশে দাঁড়ানো অপু পাগলার মত ছেলেটি নির্বিকার। আমি সাহানাকে বললাম, 'ছেলেটি কে?'

'স্যার ওকে চিনতে পারছেন না? ও তো আপনার প্রিয় ছাত্র নুহাশ।'

'নুহাশ!" আমি আকাশের ওপর স্তর থেকে মাটির নিম্ন স্তরে পড়ে গেলাম যেন। "আমার খুব প্রিয় ছাত্র। কিন্তু ওর এমন অবস্থা কেন? কোনো পীরের শিষ্য নাকি?'

দিপু আড়ষ্টভাবে বলল, 'নষ্ট হয়ে গেছে স্যার। ও নেশা করে। অবস্থা খারাপ দেখে হাসপাতাল নিয়ে গিয়েছিলাম। এখন কিছুটা সুস্থ।'

আমি বিস্ময়ে বোবা, কালা ও আন্ধা হয়ে গেলাম। নুহাশ সত্যিই আমার প্রিয় ছাত্র ছিলো। আদব-কায়দা, পড়ালেখা খুবই ভালো ছিলো। আমার ভবিষ্যদ্বানী ছিলো, সে ভবিষ্যতে একজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার জাতীয় কিছু একটা হবে এবং জীবনে সফলতা পাবে। আমার সে প্রিয় ছাত্রটি কি না আজ ডুবে গেছে অন্ধকারের অতল সীমানায়। আর অন্যদিকে দিপুকে আমি তেমন একটা পছন্দ করতাম না, উপেক্ষা করতাম। ছেলেছি ছোটকালে একরোখা, বেপরোয়া, লেখাপড়ায় একদম কাঁচা ও অমনোযোগি ছিলো। অথচ সে কি-না এতকাল পরেও আমাকে দেখে চিনতে পারল, সালাম করল। আর যাকে আমি এত আদর-স্নেহ করতাম, ভালো জানতাম সেই ছেলেটি আমার সাথে কথাও বলল না!

মানুষকে নিয়ে ধারণায় বারবারই ভুল করি। ডোরাকাটা দাগ দেখে বাঘ চেনা যায়, কিন্তু মানুষকে.....? পৃথিবীটা সত্যিই অচিনপুর। এ অচিনপুরের মানুষগুলোও সময়মত পাল্টিয়ে যায়। যাকে ভালবাসি, ভাল মনে করি সে হয়ে যায় অবাঞ্ছিত।চির চেনা মানুষ হয়ে যায় অচেনা। অচেনা, অজানা, অন্য ধারণা পোষণকৃত মানুষও আবার একদম কাছের মানুষ হয়ে যায়।

(কাল্পনিক। ঘটনাপ্রবাহ, নাম-ধাম ও চরিত্রের সাথে বাস্তবের কোনো সামঞ্জস্য নেই- লেখক)